দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই 'বিধবা বিবাহ' আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সমাজের নানান স্তরে, বিশেষত শিক্ষিত মহলের, সাহিত্য চিন্তায়—কবিতা, নাটকে, প্রবন্ধে, গল্প-উপন্যাসে—আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উঠে আসে 'বিধবার পুনর্বিবাহ' প্রসঙ্গটি। পক্ষে এবং বিপক্ষে 'বিধবার বিবাহ' এই সামাজিক বিষয়টি ঘুরে ফিরে আসে সাহিত্যের কাহিনী সংঘটনে ও চাপান-উতরে। উনিশ শতকে বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের তালিকা বিশাল। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে 'বিধবার পুনর্বিবাহ' এই সামাজিক ঘটনা। একদিকে সংবেদনশীলতা, অন্যদিকে কটাক্ষ ও মুখরোচক প্রণয়-কাহিনীর বৃত্তে বিধবা চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে।

১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব'* (১মখণ্ড) গ্রন্থটি প্রকাশের পর সমাজের সর্বস্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত'* গ্রন্থে এই বইটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে লিখেছেন, —*''বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয় আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার দশ সহস্র মুদ্রিত করেন।''*[১] *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব'* বিষয়ক গ্রন্থে পরাশরসংহিতার শ্লোক তুলে বিদ্যাসাগর লিখলেন,—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যে বিধীয়তে।''[২]

—পরাশর সংহিতার এই শ্লোকের অর্থ হল,—স্বামী যদি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ হন, মারা যান, প্রব্রজ্য

অবলম্বন করেন, ক্লীব, অথর্ব বা পতিত হয়,—তাহলে এই পাঁচপ্রকার আপদকালীন পরিস্থিতিতে নারী পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ করতে পারে। বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার পর একাধিক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং লেখনী ধারণ করেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রবল বিরুদ্ধে ছিলেন,– ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, হারাধন কবিরাজ, রামদয়াল তর্করত্ন, রামধন বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ[৩]। এই পণ্ডিতদের প্রশ্নের জবাব দিতে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন,—''*বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পর চারিদিকেই নানা পন্ডিত-সমাজ হইতে ইহার প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের বৈদ্য-প্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন।*''[৪]

বিদ্যাসাগর তাঁর *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (১৮৫৫) ২য় পুস্তকে লিখেছেন—''*হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। ...বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ*

প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[৫]

বিধবা বিবাহ বিষয়ক বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরুদ্ধ সমালোচনার তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। বিদ্যাসাগরেরর এই একটি গ্রন্থ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক গ্রন্থ রচনার কেন্দ্রভূমিতে থেকেছে। বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয় প্রস্তাব'* গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উদ্দীপনা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন,—*"১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবাবিবাহ উচিত কিনা" একটী ক্ষুদ্র চটী* [পুস্তিকা] *প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এ চটী* [পুস্তিকা] *বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগদান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক।"*[৬]

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বহুপূর্বে সমাজের নানান স্তরের বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। চেষ্টা চলেছিল বাল বিধবার পুনর্বিবাহ দেবার। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন পূর্বকালে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে বেশ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মার *'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়কব্যবস্থা'* (১৭৬৭ শকাব্দ,১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ), রামজয় শর্ম্মার *'বিধবা-বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা'* (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এ গ্রন্থে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা লিখেছেন, —*"কলিযুগে মুনিদিগের বাক্যদ্বারা বিধবাদিগের বিবাহ যে বেদমতে নিষিদ্ধ তাহার প্রতি সদাচার প্রমাণও আবশ্যক হয় কেননা মিতাক্ষরাধৃত বচনে কহে লোকে যে কর্ম্মকে দ্বেষ করে তাহা করিলে স্বর্গ হয় না এজন্য তাহা আচরণ করিবেক না এই নিমিত্ত ঐ বচনে সদাচারেরও প্রামাণ্য কহিতেছেন যে নিবর্ত্তিত কার্য্যে সাধুরদিগের আচারও বেদের ন্যায় প্রমাণ হয় অতএব বিধবা*

বিবাহ নিষেধ।"[৭] আটাশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাবন্ধিক গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা, সংস্কৃত শ্লোক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সহযোগে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছেন কঠোর ভাবে। তাঁর কাছে বিধবা বিবাহে নারী কুল জাতি পতিত হয় এবং বিধবা হিন্দু নারী 'বেশ্যা'তে পরিণত হয়। তাই তাঁর অভিমত সাধুরা কখন স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ অনুমোদন করবেন না।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকা বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সপক্ষতায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৭৭৬ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে *'তত্ত্ববোধিনী'* পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'*—এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থ প্রকাশের পর পরই,—সমকালে পক্ষে-বিপক্ষে প্রকাশিত হয় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ,—শিবনাথ রায়ের *'বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা'* (১৮৫৫),মধুসূদন স্মৃতিরত্নের 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' (১৮৫৫/১মপুস্তক), রাখালদাস হালদার রচিত 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত"[৮] (১০ই মার্চ ১৮৫৫)। বর্দ্ধমানের অধিবাসী শিবনাথ রায় *'বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা'* গ্রন্থে লিখেছেন,—"*কলিযুগে বিবাহিত বিধবার গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা কোনক্রমেই পরাশরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারেনা তাদৃশ পুত্রের পৌনর্ভব সজ্ঞা পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগের ব্যবহার ছিল যদি কলিযুগে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলা আবশ্যক হইত তবে পরাশর কলিযুগের পুত্র গণনাস্থলে অবশ্যই পৌনর্ভব শব্দই নাই অতএব কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই...।*"[৯]

বিদ্যাসাগর পঞ্চ আপদে (নষ্ট, ক্লীব, মৃত, পতিত, উদাসীন) নারীর পুনর্বিবাহের কথা বলেছেন। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের একটা বড় যুক্তি ছিল,—একবার কন্যাকে সম্প্রদান করলে কন্যার ওপর আর পিতার স্বত্ত্ব থাকে না। অতএব কন্যা বিধবা হলে দ্বিতীয়বার তাকে দান করা শাস্ত্রসম্মত নয়। বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যের জবাবে জানিয়েছেন,—'*কন্যাদানস্থলের দান বাচনিক দান মাত্র, ভূমি ধেনু প্রভৃতির ন্যায় স্বত্ত্বমূলক দান নহে।*' যে নারী, পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, এবং তার গর্ভে যে পুত্র জন্মায় তাকে পৌনর্ভব বলে।

বিদ্যাসাগর তাঁর *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* গ্রন্থে বলেছেন,—বিধবা বিবাহকে মনু এবং পরাশর কেউই নিষিদ্ধ বলে মনে করেননি। তিনি

মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,—অর্জুন বিধবা নাগকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অর্জুনের ঐরাবত কন্যা বিবাহের ঘটনা বিধবা বিবাহকেই সমর্থন করে। এই ঘটনাই কলিযুগের বিধবা বিবাহের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। সমকালে পণ্ডিতেরা এই মতের খণ্ডন করে বলেছেন, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিকালেই পান্ডবদের জন্ম হয়েছিল। বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে, সমাজে দারুণ রকমের ব্যভিচার দেখা দিয়েছে এবং ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা বেড়ে গেছে। এর পাল্টা যুক্তি দিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা জানিয়েছেন, ব্যভিচারে সধবা রমণীরাও লিপ্ত। পরাশর ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম —এই তিন প্রকার পুত্রের কথা বলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিরোধীদের মূলত একটাই বক্তব্য—'নষ্টেমৃতে' বচনে মনু বাগদত্তা নারীর পুনর্ব্বিবাহের কথা বলেছেন,—বিধবা নারীর বিবাহের কথা বলেননি।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিধবা বিবাহ বিষয়কে কেন্দ্র করে তর্কমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা একাধিক। প্রসঙ্গত একটা তালিকা প্রদান করা যেতে পারে—[১০]

বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (১৮৫৬ খ্রীঃ)—নন্দকুমার কবিরত্ন।

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা (১৮৬৩ খ্রীঃ) — কৈলাসবাসিনী দেবী।

কলিযুগে বিধবা বিবাহ নিষেধ (১৮৬৪ খ্রীঃ)—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭০ খ্রীঃ)—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বিধবা বিবাহ (১৯২৮ সম্বৎ/ইং১৮৭২ খ্রীঃ)—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

হিন্দু বিধবা বিবাহ সমালোচনী (১৮৭৫ খ্রীঃ)—যাদব চন্দ্র দাস।

বিধবাবিবাহের নিষেধক (১৮৭৭ খ্রীঃ)—শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীত।

সাম্য (১৮৭৯ খ্রীঃ)— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুবিবাহ সমালোচন—(১৯৩৫ সম্বৎ [ইং ১৮৭৯ খ্রীঃ],২য় খন্ড)—ভুবনেশ্বর মিত্র।

The Law Relating ToThe Hindu Widow (1881 AD)-Trailokyanath Mitra, Calcutta.

বিধবা (১৮৮২ খ্রীঃ) —শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ (১৮৮৪ খ্রীঃ) —সত্যচরণ মিত্র।

বঙ্গ-মহিলা (১৮৮৪ খ্রীঃ)—শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা।

বঙ্গ বিধবা বিপদভঞ্জন (১৮৮৪ খ্রীঃ)—যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধবা বিবাহ খণ্ডনং (১৮৮৫ খ্রীঃ)—শ্রীশিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শান্তিপুর।

বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা (১৮৮৫ খ্রীঃ)- (ছদ্মনাম)

শ্রীগণ্ডুষ জল সঞ্চরি

বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ (১৮৮৬ খ্রীঃ)— শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন।

বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ (১৮৮৬ খ্রীঃ)— প্রসন্ন কুমার শর্ম্মা, ময়মনসিংহ।

বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা (১৮৮৬ খ্রীঃ)—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিবাহসংস্কার (১৮৮৮ খ্রীঃ) — দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

অবলা-বান্ধব (১৮৮৯ খ্রীঃ)—শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ (১৮৮৯ খ্রীঃ)—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি, কলিকাতা।

অধিকাংশ প্রবন্ধ গ্রন্থ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে লেখা। এছাড়া সমকালে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বামাবোধিনী, নবজীবন, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে ও বিরোধিতা করে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নীতিগত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহকে সমর্থন না জানালেও তাঁর *'সাম্য'* (১৮৭৯) গ্রন্থে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গে বিধবা বিবাহের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন। *'সাম্য'* প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—*''মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। ...যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণের সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। ...অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজ মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই,—*

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখ জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামীগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিতে পারেন।

...উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়।

বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা।... যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।...পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।''[১১]

'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধ গ্রন্থে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র খুব জোরের সঙ্গেই বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা উপন্যাস সাহিত্যে দেখেছি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে কাহিনী নির্মাণ করেছেন এবং নীতিগত প্রশ্নে বিধবা বিবাহকে সাংসারিক গোলযোগ ও সমাজ-পরিবার ভাঙন ও অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হিসাবে দেখাচ্ছেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্র *'সাম্য'* প্রবন্ধ গ্রন্থে যুক্তি পরম্পরায় বিধবা বিবাহের পক্ষেই সওয়াল করছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখেছেন,—'' *যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়...অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে।...কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃত ভার্য্যাপুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?''*[১২]

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র 'বিধবাবিবাহে'র অন্তরায় রূপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন,— এক. পুরুষজাতি সমাজের কর্ত্তা এবং তারাই সমাজনিয়ন্ত্রক। দুই. লোকাচারের অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরসম বাধা ও লোকভয়।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ চালু হবার পর উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় স্থান করে নেয় বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ। লেখা হয় গান, কাব্য—কবিতা, ছড়া, প্যারোডি। ছড়া কবিতা গান

প্যারোডি প্রভৃতিতে হিন্দু নারীর পুনর্বিবাহের ঘটনায়, হাস্য কৌতুক ও বিদ্রুপের প্লাবন বয়ে যায় নগর কলকাতায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ বিষয়ক এতদবিষয়ক প্রস্তাব'(১৮৫৫)* গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বিধবা বিবাহের সমর্থনে *'সমাচার সুধাবর্ষণ'* পত্রিকায় 'বিধবা বিবাহ' নামক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্ভবত বিধবা বিবাহের সমর্থনে প্রকাশিত প্রথম কবিতা এটি। চুয়ান্ন ছত্রের দীর্ঘ এক কবিতায় সমকালীন বিধবা বিবাহের আগাম উন্মাদনার ছবি লক্ষণীয়—

'' শুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার।

.....

হইয়াছে যত গ্রন্থ বিবাহ বিপক্ষে।

তিষ্ঠীতে না পারিবেক সাগর সমক্ষে।

...সাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল।

তোমাদের সৌভাগ্য ঈশ্বর সানুকূল।।

... আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে।

শঙ্খ শাড়ী পরিয়া প্রস্তুতভাবে রবে।।

পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র।

খাটিবেনা আর কারু তাল মান যন্ত্র।।"[১৩]

বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (কবি ধীরাজ) লেখেন একটি গান, যা সেকালের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এমনকি, শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ের পাড়ে লিখে দেন এই গান,—

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,

সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

কবে হবে এমন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,

বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,

সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে।

আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,

রাধাকান্ত মনোভারান্ত দিলেন নাকো সই,

লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজ ভয়ে।"[১৪]

বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত' গ্রন্থসূত্রে জানা যায়, শান্তিপুরের তাঁতিদের বোনা এই বহুমূল্য দামের কাপড় পরে সেকালের অনেক অসহায় বিধবা নারী কলকাতায় আসতেন বিদ্যাসাগরকে দেখাবার জন্য। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদীরা পয়সা দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ছড়া কাটিয়ে লিখিয়েছিলেন,—'*শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররুগী হয়ে।*' (প্যারাডী)। সেকালের বিশিষ্ট গীতিকার রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের দাদা) বিধবা বিবাহকে ব্যঙ্গ করে একটি জনপ্রিয় গান লেখেন,—

'' বেঁচে গেলুম অলো দিদি একাদশীর দায়ে,
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে,
শাঁখা, খাড়ু, পড়বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে,
শাড়ী, সিন্দুর, পরে আবার বেড়াব লো এয়ো হয়ে।
জামাই আসবেন শ্বশুর বাড়ী, বেশ করিব তাড়াতাড়ি,
গা দুলিয়ে চল্‌ব (আবার) হরেক রকম বাহার দিয়ে।।"[১৫]

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকার হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—''*স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের মত চলিত করিলে রঙ্গলাল বাবু হাস্যোদ্দীপক এই গান বাঁধিয়াছিলেন।...ডাঁড়কায় [দ্বারকায়] রঙ্গলাল বাবু একটি ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন। সেই সভার জন্য তিনি গান রচনা করেন।*"[১৬]

উনিশ শতকের অন্যতম চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ও কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) সমকালীন বিধবার পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গটিকে কবিতার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিধবা বিবাহকে ঈশ্বর গুপ্ত তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের শাণিত উচ্চারণে কবিতায় তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত 'বিধবা বিবাহ' প্রসঙ্গ অবলম্বনে দুটি কবিতা রচনা করেন—*'বিধবা-বিবাহ'* (৪৪ ছত্রের কবিতা), *'বিধবা বিবাহ আইন'* (৮২ ছত্রের কবিতা)। *'বিধবা বিবাহ'* কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন,—

"বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে,বাজিয়াছে ঢোল।।
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি, মাতিয়াছে সব।।'[১৭]

এ কবিতায় কবি সমকালীন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের মতামত ও কলকাতার হুজুগে

বাঙালির ছবি এঁকেছেন। 'অক্ষতযোনি'র বিধবা ও 'ক্ষতযোনি'র বিধবা উভয়েরই পুনর্বিবাহকে কটাক্ষ করেছেন গুপ্ত কবি,—

'' অনেকেই এইমত লভেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির'' বটে বিবাহ-বিধান।।
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক্ যত রাঁড়ী আছে।
.....
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বলে।।
.....
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব।।
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে।।"[১৮]

বস্তুত 'বিধবা বিবাহ' নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে যে কৌতূহল ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তারই এক জীবন্ত ছবি উপস্থিত করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত; বাল বিধবার বিবাহ দিতে সবাই উৎসুক। কিন্তু অনেকেই আশঙ্কা করেছেন, বাল বিধবার বিবাহের সুযোগ নিয়ে না প্রৌঢ় বিধবা বৈধব্য আচার ফেলে পুনর্বিবাহের সামিল হয়ে যায়। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন *'বিধবা-বিবাহ আইন'* নামক এক দীর্ঘ কবিতা। এ কবিতায় 'বিধবা বিবাহ আইন' বিলকে গ্রান্টের 'কাল বিল' বলে উল্লেখ করেছেন,—

'' গ্রান্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ।"[১৯]

তিনি আরো জানিয়েছেন,— ইংরেজ রাজা হয়ে পরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত হয়নি। প্রবল বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন,—

"কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী।

তাহারা সধবা হবে,পরে শাঁকা শাড়ী।।

এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।

কেমন কেমন করে মনের ভিতর।।

শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে?

দেশাচারে ব্যবহারে, বাধো বাধো করে।।"[২০]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিষ্ঠ ভাবে 'বিধবার' পুনর্বিবাহের বিষয়টি নিয়ে শুধু ব্যঙ্গই করেননি, রীতিমত গালমন্দ করেছেন। পরবর্তী কালে আমরা দেখবো পাঁচালীকার দাশুরথি রায় কবি ঈশ্বরগুপ্তকে কটাক্ষ করেছেন, নিন্দা করেছেন।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট পাঁচালীকার, ছড়াকার ও লোককবি হলেন দাশুরথি রায় (১৮০৫-১৮৫৭)। তাঁর পাঁচালীতে যেমন উঠে এসেছে পৌরাণিক বিষয়সমূহ তেমনি সমকালীন সমাজ বিষয় তাঁর পাঁচালীর প্রধান অবলম্বন হয়েছে। বঙ্কিচন্দ্র যেমন কবি ঈশ্বরগুপ্তকে বলেছিলেন, —'*খাঁটি বাঙালি কবি*', তেমনি রসিকচন্দ্র রায় লিখেছেন,—'*দাশরথিই খাঁটি বাঙ্গালীর শেষ কবি*।' দাশুরথি রায় ছিলেন, একাধারে শিক্ষিতজনের কবি ও অশিক্ষিতজনের কবি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেখানে রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে 'বিধবা বিবাহে'র মত সমাজের প্রগতিশীল বিষয় নিয়ে বিরোধিতা করেছেন, সেখানে দাশুরথি রায় বিধবা বিবাহকে 'সমাজ মঙ্গল' হিসাবে দেখেছেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ চালু হবার পর তিনি সমকালীন 'বিধবা বিবাহ' বিষয়কে সমর্থন করে লেখেন *'বিধবা বিবাহ'* পাঁচালী পালা। নারীর বয়ানে বিদ্যাসাগরকে দাশুরথি রায় 'গুণনিধি অবতার' রূপে বর্ণনা করেছেন,—

"*আমাদিগের দিতে নাগর*

এলেন গুণের বিদ্যাসাগর,

বিধবা পার করিতে তরির [*তরী'র*], *গুণনিধি।*"[২১]

দাশুরথি রায়ের *'বিধবা বিবাহ'* পাঁচালীতে পাওয়া যায়,—তর্কে বিতর্কে উত্তাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি,—

"*বিধবার বিবাহ কথা*

কলির প্রধান কলিকাতা,—

নগরে উঠেছে এই রব।

কাটাকাটি হচ্ছে বাণ

ক্রমে দেখছি বলবান

হবার কথা হয়ে উঠেছে সব।"[২২]

পুনর্বিবাহে দুঃখী বিধবা নারীদের পূর্ব স্বামীসুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি দাশরথি রায়,—

"সই লো! তোর মরা মানুষ ফিরেছে।
কিন্তু পচে নাই, কিঞ্চিৎ রসেছে।।
আমি দেখে এলোম [এলেম] রাণাঘাটে,
ভাসতে ভাসতে আসতেছে।।
...শুন ও লো মতি! হবে তোর পতি,
আবার অভিমানে, মনের দুঃখে,
ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে।"[২৩]

'বিধবা বিবাহে'র বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তি যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এবং বিধবাদের মুখে হাসি ফুটবে, সেই আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে দাশরথি রায়ের 'বিধবা-বিবাহ' পাঁচালীতে; এ পালায় তিনি লিখেছেন,—

"*বিধবা করে গর্ভ-পাত, অমঙ্গল উৎপাত,*
এতে রাজার রাজ্য হতে পারে?
হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না বলে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিক্‌বে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত।"[২৪]

বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে দাশুরথি রায় সওয়াল করেছেন তাঁর পাঁচালীতে। এমনকি বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যাঁরা তাঁদেরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্রূপ করেছেন,—

"*কতকগুলো অদার্ম্মিকে, বিপক্ষ বিধবার দিকে,*
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়—
তারা বিপক্ষ হয় হয়ে বাদী।
ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে,
নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,—

হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন

বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।"[২৫]

কবিগানের ঢঙে দাশরথি রায় বিধবা বিবাহের বিরোধী পক্ষ এবং জাতিতে বৈদ্য ঈশ্বরগুপ্তকে কটাক্ষ ও কটুক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন— হিন্দু নারীর বৈধব্য একটা রোগ। এর প্রতিকার হওয়া দরকার। বিধবা বিবাহ যেন বিধাতার অবিচার। ঈশ্বরের প্রতি কবি প্রশ্ন তুলেছেন,—

"অবিচার বিধাতার দেহে নাই ধর্ম্ম তার

নারী পুরুষ তাঁর দুই সৃষ্টি।

বিধাতা পুরুষদিগকে,

দেখেছে কি সোণার চখে,

রমণীদিগে কেবল বিষদৃষ্টি।।

এত বিধির পক্ষপাত!

রমণীর পক্ষে পক্ষাঘাত,

পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ভারি।"[২৬]

কবি এভাবেই নারীর প্রতি সহমর্মিতায় একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন সমকালে অনেকেই মনে করেছেন, হিন্দু বিধবার বিবাহ অসম্ভব। কবি লোক মুখের সেই অসম্ভব গুঞ্জনকে তাঁর এই পাঁচালীতে রূপ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি কবি তুলে ধরেছেন প্রৌঢ় রমণীর 'বিধবা বিবাহ' না হওয়ার আক্ষেপ। প্রৌঢ়া রমণীর বিধবা বিবাহে আগ্রহ থাকলেও যেহেতু তিনি বিগত যৌবনা তাই তাঁর আক্ষেপের অন্ত্য নেই,– *"প্রবীণে বলে, শুনেছি ভাই!*

ছার কথায় আর কাজ নাই,

বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ?

নাক মুখ চক্ষু বুক, বজায় আছে তোদের সুখ,

এসে, ভ্রমর তোদের যৌবন-কমলে বসুক।।

আমার, বয়স প্রায় বাহাত্তর,

মনের মতন পাত্তর,

আর তো কেউ যুটিবে না লো ঘরে।"[২৭]

বিধবা বিবাহ চালু হওয়া এবং প্রৌঢ় বিধবার পুনর্বিবাহ না হওয়ার আক্ষেপ-যন্ত্রণার প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবি দাশরথি রায় তাঁর *'বিধবা বিবাহ'* পাঁচালী কাব্য শেষ করেছেন।

১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের *'মেঘনাদবধ কাব্য'*। এ-কাব্যে বিধবা প্রমিলাকে কবি মহাবীর্যবতী নারী রূপে চিত্রিত করেছেন। ঈন্দ্রজিতের চিতায় আরোহন দৃশ্যে কবি প্রমীলার বৈধব্য বেদনাকে হাহাকারে পরিণত করেছেন কবি,—

'' অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
.....
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি?''[২৮]

প্রমীলা যদিও সহমরণে গেছে। তাকে বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। বৈধব্য যন্ত্রণার আর্তি ফিরে এসেছে মধুসূদনের *'বীরাঙ্গনা'* (১৮৬২) পত্রকাব্যের *'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'* পত্রে। রামায়ণ কাহিনী সূত্রে জানা যায়, সুর্পণখার স্বামী ছিলেন বিদ্যুৎজিহ্ব। রাবণ তাঁকে চিনতে না পেরে তীরবিদ্ধ করে তাঁর মৃত্যু ঘটান। শূর্পণখা রাবণকে তিরস্কার করেন। লজ্জায় শোকে রাবণ শূর্পণখাকে কথা দেন, বিধবা বোন শূর্পণখাকে—দান, মান ও প্রসাদ দ্বারা তিনি পালন করবেন। বিধবা শূর্পণখা অরণ্যে রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ প্রস্তাব দেন। লক্ষ্মণ শূর্পণখার প্রেম প্রত্যাখান করেন এবং শূর্পণখা পীড়াপীড়ি করলে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দেন। *'বীরাঙ্গনা'* পত্রকাব্যে *'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'* পত্রে মধুসূদন শূর্পণখার প্রেম ভাবনার রূপ নির্মাণে বিধবার মর্মজ্বালাকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বুনে দিয়েছেন,—

'' মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে!
.....
...এস গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
.....
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জকেশি, কুল, মান, ধনে,

.....

...কর দয়া কর মোরে।

প্রেম ভিখারিণী আমি তোমার চরণে।"[২৯]

বিদ্যাসাগর তাঁর *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব'* গ্রন্থে লিখেছেন, —*'পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির...দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায় না।'* শূপর্ণখা সেই রক্তমাংসের মানবী বিধবা কামনা বাসনা বা রিপুকে দমন করতে পারেনি। তার কামনা প্রেম হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে সুদর্শন লক্ষ্মণের কাছে । শূর্পনখার এই প্রেম নিবেদনের মধ্যে অকাল বৈধব্যের অতৃপ্তিজনিত মর্মজ্বালা ও প্রেমবাসনা ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকে মহাকাব্যের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চূর্ণ কবিতায় সমকালীন বিধবা বিবাহ বিষয়কে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে বিধবা রমণীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'কবিতাবলী'* (১৮৭০ ১ম খণ্ড) গ্রন্থের *'বিধবা রমণী'* ও *'হতাশার আক্ষেপ'* কবিতা দুটিতে বিধবার মর্মজ্বালাকে স্থান দিয়েছেন। *'বিধবা রমণী'* কবিতায় হেমচন্দ্র লিখেছেন,—

"*ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে!*
না হলে এমন দশা নারী আর কইরে;
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ!"[৩০]

বিধবা হওয়ার পর নারীর যে কুসুম চন্দন, কর্পূর তাম্বুল গ্রহণের অধিকার চলে যায় সেকথা সহমর্মিতার সঙ্গে বলেছেন কবি। বিধবা নারীর মুখে না থাকে হাসি, নয়নে না থাকে জ্যোতি—শুধু ধরা দেয় মলিন বিষাদ। কবি বাঙালি জাতির পাষাণ হৃদয় ও শাস্ত্রের নিষ্ঠুর বিধানকে আঘাত হেনে বলেছেন,—

"*হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,*
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ঠ করে দেশাচার ।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?

পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে

অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে?"[৩১]

একান্নটি ছত্রে ও ছয়টি স্তবকে বিন্যস্ত এই দীর্ঘ কবিতায় কবি বিধবা নারীর আর্তিকে সহমর্মিতার সঙ্গে অনুভব করেছেন এবং চিত্রিত করেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'কবিতাবলী'* (১মখন্ড) গ্রন্থের *'হতাশার আক্ষেপ'* কবিতায় পুনরায় উঠে এসেছে মলিনমুখী বিধবা নারীর করুণ প্রতিচ্ছবি। এ কবিতায় কবি দুই যুবক-যুবতীর ব্যর্থ প্রণয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। লোক-লজ্জা মান ভয়ে ও সমাজ অনুশাসনের কারণে পিতামাতা কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিয়ের অল্পকাল পরেই নারীটি অকাল বৈধব্যের স্বীকার হয়েছে। এই করুণ পরিণতির জন্য কবি দুষ্ট দেশাচারকে দোষারোপ করেছেন,—

'' কত ক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ''

ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে।

বদন চুম্বন ক'রে রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,

শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—

"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,

ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"[৩২]

ত্রিপদী বিন্যাসে পঞ্চাশটি ছত্রে ও এগারটি স্তবকে বিন্যস্ত *'হতাশার আক্ষেপ'* কবিতায় কবি সমাজ অনুশাসন জনিত কারণে ঘটে চলা ব্যর্থ প্রণয় ও বৈধব্যের অভিশাপ ও মনোজ্বালাকে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চিত্রিত করেছেন।

উনিশ শতকের মহাকাব্য রচনাধারার বিশিষ্ট কবি হলেন নবীনচন্দ্র সেন। তাঁর কবিতায় শোনা গেছে নবজাগরণের বাণী। উনিশ শতকের যুগপটে দাঁড়িয়ে সমকালের প্রগতিশীল বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন চূর্ণ কবিতার মধ্য দিয়ে। তাঁর *'অবকাশরঞ্জিনী'* কাব্যের (১ম খণ্ডও ২য় খণ্ড ১৮৭১), *'বিধবা কামিনী', 'প্রতিমা বিসর্জন', 'বিষণ্ণকমল', 'কে তুমি', 'অবলাবান্ধব'* প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ। *'বিধবা কামিনী'* কবিতাটি লেখা হয় ১৮৬৪ সালে। কবি নবীনচন্দ্র তখন কলেজের ছাত্র ও তরুণ কবি। 'বিধবা কামিনী' ছেচল্লিশটি স্তবকে বিন্যস্ত ১৮৪ পংক্তির দীর্ঘ কবিতা। কবিতা না বলে এটাকে আখ্যানকাব্য বলাই সঙ্গত হবে। এই কবিতায় কবি বিধবা নারীর দুর্নিবার রিপুর জ্বালাকে তুলে ধরেছেন,—

'' কে জানে মানস-বৃত্তি এত দুর্নিবার,

বুঝাইলে তবু নাহি বুঝে পাপ মন ?
গোপনে, অজ্ঞাত, দুষ্ট করে অত্যাচার,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করে আচরণ ?"[৩৩]

বিধবা নারী মন দহনে কষ্টে আজ অনুজ্জ্বল। জীবনের সব রঙ সব সুখ বৈধব্যের মলিনতায় আজ আচ্ছন্ন। কবি লেখেন,—

"*মলিন বদন আহা ! মলিন বসন,*
মলিন রূপের আভা মলিন বরণ,
চন্দ্রমুখ হইয়াছে কালীর বরণ,
এতই নিষ্ঠুর কি হে বিধাতার মন !"[৩৪]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত 'বিধবা বিবাহ' আদৌ সমাজের সর্বস্তরে গৃহীত হবে কিনা এই নিয়ে নারীর অন্দর মহলে নানা কুণ্ঠাবোধ ও সংস্কারের অবগুণ্ঠন ছিল। 'বিধবা বিবাহ' আইনত ও শাস্ত্রগত ভাবে স্বীকৃতি পেলেও অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক অনুশাসন, রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামো বিধবা বিবাহের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর *'প্রতিমা বিসর্জ্জন'* কবিতায় এক বিধবা নারীর আত্মকথনে পুনর্বিবাহের দ্বিধা সংকটকে প্রকাশ করেছেন এইভাবে,—

"*ভাঙ্গিয়াছে আশানিদ্রা জানিয়াছি সার,*
হবে না, হবে না তুমি, হবে না আমার।
উদ্বাহ-বন্ধনে (কিবা বিধাতার)
হবে না আমার তুমি, হব না তোমার।"[৩৫]

কবিতার শেষে কবি জানিয়েছেন, দুঃসহ বেদনার দহে আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়েছে বিধবা নারীটি,—

"*শব দেহে সব সবে, বিদায় এখন*
.....
নিরাশার কাল ছুরি হানিলাম বুকে,
যায় যায় যাক প্রাণ কায কি এ দুখে।"[৩৬]

'বিষণ্ণ কমল' কবিতা কবি নবীনচন্দ্র সেন, বাল বিধবার প্রাণোচ্ছল জীবনীশক্তির মধ্যে মলিনতার বৈধব্য আচারকে চিত্রায়িত করেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন সমাজের কাছে। দেশাচারকে কটাক্ষ করেছেন কবি,—

"পোড়া দেশাচার এমন রতনে,
অযতনে এত কিসের লাগিয়া;
কিসের লাগিয়া সোণার যৌবনে
বিকচ নলিনী মরে শুকাইয়া?"[৩৭]

'বিধবা বিবাহে'র বিরুদ্ধচারীদের প্রতি কবি বিষোদ্‌গার করেছেন এ কবিতায়। যাঁরা বিধবা বিবাহের বিরোধী, কবি তাঁদেরকে,—পাষাণ হৃদয়, নিরেট, অধম, অসভ্য, দেশের পাপাত্মা, হৃদয়হীন, মরম হীন বলে এক প্রকার গালি দিয়েছেন।

'কে তুমি' কবিতায় নবীনচন্দ্র বাঙালির দুর্গোৎসবের আনন্দঘন চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই আনন্দঘন মুহূর্তের মাঝে তুলে ধরেছেন এক বঙ্গ বিধবার করুণ প্রতিচ্ছবি। তিনি একাকিনী, সজল নয়না। কেননা তাঁর প্রাণোচ্ছল জীবনের সব রঙ মুছে গেছে, অকাল বৈধব্যের অভিশাপে। শারদ অর্ঘ্যের আনন্দযজ্ঞে সামিল হবার তার অধিকার নেই। বিলাস ব্যাসনে তার অধিকার নেই; নেই সবার মাঝে মিলনের আনন্দধারায় স্নাত হবার অধিকার। তিনি অবজ্ঞার মত একা, ঘৃণার মত একা। বৈধব্যের তুচ্ছ আচারের গণ্ডীতে তিনি আবদ্ধ। কবি লিখেছেন,—

"বসি' একাকিনী, সজলনয়না
কে তুমি, রমণি? কেন বিশ্বপ্লাবী
আনন্দ-প্রবাহ পশিল না তব
কোমল হৃদয়ে? ভুলিল না তাহে
একটি হিল্লোলে? ...

.....

বিষাদে নিশ্বাসি'
তুলিল বদন বামা; দেখিলাম—
বঙ্গের দুঃখিনী বিধবা রমণী।"[৩৮]

১৮৬৩ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় হরিশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' কাব্য। হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৮-১৮৭২) ছিলেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত *'মিত্র প্রকাশ'* পত্রিকার সম্পাদক। *'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'* কাব্যটিকে কবি উৎসর্গ করেন 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের কাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। *'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'* কাব্যে হরিশচন্দ্র মিত্র একটি বিধবা নারীর আত্মকথনে কঠোর ব্রহ্মচর্য ও বৈধব্য আচার পালনের ছবি এঁকেছেন। বিধবা নারীর স্বামী বিরহের পাশাপাশি, কবি

বিদ্যাসাগরের স্তুতিও করেছেন এ কাব্যে। *'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'* কাব্যের বিজ্ঞাপন অংশে হরিশ্চন্দ্র মিত্র লিখেছেন,—*''বিধবা-বঙ্গাঙ্গনা কাব্য প্রচারিত হইল। ইহা কোন বিধবার ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। বঙ্গদেশীয় বিধবা অঙ্গনাগণের মনোমধ্যে সময়২ যে সকল আক্ষেপ উদ্রিক্ত হয়, একটী সুশিক্ষিতা বঙ্গদেশীয় বিধবার বিলাপ পরম্পরায় তাহার কথঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিলাপোক্তি কতদূর হৃদয়গ্রাহিণী ও স্বভাবানুযায়িনী হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সুধীবর পাঠকবৃন্দের প্রতিই তদ্বিচার-ভার সমর্পিত রহিল।''*[৩৯]

'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' কাব্যের অধ্যায় বিন্যাসে কবি —লজ্জা, যৌবন, সন্ধ্যা আগমন, বিধাতা, বিরহ, সখীর প্রতি, একান্তে আক্ষেপ, শ্বশুরালয়ের দুই এক কথা, একটী অপূর্ণ শরীর সদ্য প্রসূত শিশু দর্শন করিয়া , হিঁদু সমাজ এবং সামাজিকগণ, দেশাচার, সুশিক্ষিতদলের প্রতি প্রভৃতি শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। উল্লিখিত শব্দবন্ধে কবি একটি নারীর বিবাহিত পারিবারিক জীবন হতে বৈধব্যের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হওয়ার ক্রমিক কাহিনীর ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়েছে। করুণ রসের ভাবপ্রবাহে কবি এ কাব্যে নারীসুলভ মানসিকতা, যন্ত্রণা ও আক্ষেপকে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের শুরুর 'মঙ্গলাচরণ' অংশে কবি লিখেছেন,—

''চির-দুখ-সিন্ধু-নীর-নিমগনা—
যতেক বঙ্গীয়-বিধবা-অঙ্গনা,
তাহাদের দুখ যাবত বর্ণনা
করি, ...''[৪০]

বৈধব্যের যন্ত্রণাকে কবি চিতার অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হবার যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌবনবতী নারীর দুর্নিবার যৌবনাবেগকে বৈধব্যের আচার দিয়ে কখনই ঢাকা সম্ভব নয়। কারণ শরীরের যৌন উদ্বেল আবেগ দেশ কাল মানে না, মানে না কোনো বিধি নিষেধ। বৈধব্যের এই অসহায়তাকে কবি এক বিধবা নারীর স্বগত ভাষণে লিখেছেন,—

'' সে সময় কত অগ্নিশিখা উদ্গীরয়,
ঋতুস্রাবে কত তার দেশোচ্ছিন্ন হয়।
আমিত অবলানারী, কত সংগোপিতে পারি,
মনোজ যাতনানল চিরভয়ঙ্কর ?
যে অনলে জ্বলে সদা মম মনোবন;
হে লজ্জে! সে অগ্নি কিছু নহে সাধারণ!''[৪১]

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ও স্যার উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর সহায়তায় 'সহমৃতা প্রথা', 'সতীপ্রথা' তথা 'সহমরণ প্রথা' সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত করার আইন পাশ হয়। 'সহমরণ প্রথা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সমাজে বাল্য বিধবার সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। দেখা দেয় বিধবার অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা ও নানা সামাজিক ব্যভিচার। এই সংকটক্ষণে জরুরী হয়ে পড়ে বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়টি। *'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'* কাব্যে যৌবনাবতী বিধবা নারীটি বৈধব্যের অসহণীয় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে,—বিধবার পুনর্বিবাহ দাবী করেছেন। এবং যদি হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সম্ভব না হয় তাহলে ফিরিয়ে আনা হোক 'সহমৃতপ্রথা' বা 'সতীদাহ' প্রথা। কারণ বৈধব্যের যন্ত্রণা অপেক্ষা সহমরণের যন্ত্রণা অনেক সুখের। কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ও যুক্তি পরম্পরায় বিধবার আত্মকথনে লিখেছেন,—

'' সহমৃতাপতিসহ, যাওয়া নহে দুঃখাবহ,
বাঁচিয়া বিধবাগণে যত দুঃখসয়,
জ্বলচ্চিতা পশা তত দুঃখময় নয়।
.....
ভালছিল একদিন দহন দাহন, ক্লেশ
সহিত পরাণে,
বহিতে হতনা আর, দারুণ বৈধব্য ভার,
যে বহে এভার, সেই এর দুঃখ জানে।
.....
ওগো ইংলণ্ডেশ্বরি, হয় দেহ দয়া করি,
বিধবাবিবাহপ্রথা বঙ্গে প্রচলিত,
নহে সহমৃতাপ্রথা কর প্রবর্ত্তিত!''[৪২]

১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ' আইনত স্বীকৃত হলেও সে ভাবে বিধবা বিবাহের হিড়িক বা উদ্দীপনা সমকালে লক্ষ্য করা যায় নি। বিধবা বিবাহ আইনত চালু হওয়ার আট বছর পর প্রকাশিত *'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'* (১৮৬৩) কাব্যে বিধবার মর্মজ্বালা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহের উদ্দীপনা সম্পর্কে নিরাশ হয়েছেন। আলোচ্য কাব্যের অন্তিম অংশে কবি 'বিধবা বিবাহে'র মঙ্গলময় সমাজ অনুষ্ঠানে যেমন আপ্লুত হয়েছেন, তেমনি অবাধ বিধবা বিবাহের আশা প্রকাশ করেছেন,—

'' মাঝে মাঝে আজ কাল বিধবার বিয়া হয়,

হেথায় হোথায়,

শুনে একবারে মন, আহ্লাদে হয় মগন,

আসি কুহকিনী আশা কত না বুঝায়।

আহা! বঙ্গদেশময় বিধবার পরিণয়

প্রথা, কতদিনে হবে অবাধে চলিত,

হে বিধি! এমনদিন হবে উপস্থিত?"[৪৩]

বিরাশি পৃষ্ঠার দীর্ঘ *'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা'* কাব্যের প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রতি ছত্রে ছত্রে কবি বিধবা নারীর মনোপীড়াকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ কাব্য হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের বিশিষ্ট শোককাব্য। *'হিন্দুহিতৈষিণী'* (১৮৬৫ খ্রীঃ)পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। হরিশ্চন্দ্র প্রথমে বিধবা বিবাহের সপক্ষে ছিলেন, কিন্তু 'ঢাকা হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা'র সঙ্গে যুক্ত হবার পর বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কলম ধরেন হরিশ্চন্দ্র। ১৮৬৫ সালে *'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'* পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়,—"*হরিশবাবু এত কাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণে তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণে এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।*"[৪৪]

উনিশ শতকের বিশিষ্ট গীতি কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)। তাঁর গীতিকবিতা রচনার বিষয় নির্বাচনে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ। ইংরেজিতে লিখেছেন,—'*The Hindu -Child Widow*' নামে কবিতা। *'আমি কে', 'বিধবার আরশি', 'তারপর', 'সধবা', 'বিধবা'* প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বিধবার মানসিক সংকট ও যন্ত্রণাময় জীবন যাপনের ছবি। 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থের *'আমি কে'* কবিতায় কবি লিখেছেন,—

" *এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,*

তাহারি মুরতি মোর হৃদয়েতে রাজে।

পাটল অধরে তার,

চঞ্চল-ধূসর কেশে

ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—"[৪৫]

'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের 'বিধবার আরশি' কবিতায় কবি বিধবা নারীর নিরাভরণ জীবন যন্ত্রণার ছবিকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। বৈধব্য শুধু যে প্রিয়জনকে কেড়ে নেয়, তা নয়—তার সঙ্গে কেড়ে নেয় নারীর অলঙ্কার সজ্জিত জীবনের সুখ অধিকার। নারীর অলঙ্করণের প্রিয় সঙ্গী 'আরশি'

বৈধব্যের পর হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় এবং সুখস্মৃতির এক উপকরণ মাত্র। 'বিধবার আরশি' কবিতায় কবি লেখেন,—

''বিধবার আর্শি খানি পড়ে আছে এক পাশে,—
কালি-ঝুল মাখিয়া শরীরে।
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে-চুপে কহে কথা,
মনোদুঃখে গুমরে গুমরে,—''[৪৬]

'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের *'তারপর'* কবিতায় কবি বিধবা নারীর বিরহ-দুঃসহ সংসার যাত্রা নির্বাহ করে ও অনাথিনী জীবন ত্যাগ করে স্বর্গলোকে মিলনের ছবি এঁকেছেন। কবি লিখেছেন,—

''স্বামী গেল মরি!
—তারপর?
.....
তারপর অতি কষ্টে, করিল অনেক চেষ্টা
দুষ্কর সংসার-যাত্রা করিতে নির্বাহ!
.....
তারপর, একদিন, "হা নাথ যো নাথ'' করি
অনাথিনী জীবন ত্যজিল?''[৪৭]

'অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থের *'সধবা'* কবিতায় কবি 'বিধবা' নারীর অন্তর্জ্বালাকে প্রকাশ করেছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর *'অশ্রুকণা'* (১৮৮৭ খ্রীঃ) কাব্য পাঠ করার পর কবি 'সধবা' কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় কবি লিখেছেন,—

''বিধবা সে; আমি তারে ভালো করে চিনি
সবে করে উলুধ্বনি, ছাল্‌না-তলায়, [*ছাদ্‌না তলায়*]
'এয়ো' সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায়;
উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমণী!''[৪৮]

বিবাহের আচার শুধুমাত্র সধবাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেখানে বিধবা নারীর প্রবেশাধিকার নেই। আর তাই কৌতুক-কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বিধবা নারীকে সধবার স্ত্রী আচারে স্থল ত্যাগ করে নীরবে চলে যেতে হয়। এই সমাজ আচার যে কত অসহণীয় কবি তা এ কবিতায় উদ্‌ভাসিত করেছেন। *'অপূর্ব নৈবেদ্য'* (১৯১২ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থের *'বিধবা'* কবিতায় বঙ্গের মহিলা কবি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অকালবৈধব্য স্মরণ করে কবি এ কবিতাটি রচনা করেন। কবি লিখেছেন, —

"চিনেছি; চিনাতে আর কবে না তোমায়।
বঙ্গের বিধবা তুমি আজন্ম-দুঃখিনি!
শ্মশান হইতে আনি এক মুষ্টি চিতানল,
জ্বালিয়ে রেখেছ বক্ষে দিবস যামিনী।"[৪৯]

দশ বছর বয়সে বধূ হয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯৫৪ খ্রীঃ) শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়ে যৌবনে যোগিনী হতে হয় তাঁকে। তাঁর এই শোকভাষা কাব্যরূপ পেয়েছে *'কবিতাহার'* (১৮৭২) কাব্যগ্রন্থে'র *'সঙ্গিনীর বৈধব্য'* নামক কবিতায়,—

"ভুজঙ্গিনীসম বেণী যার শিরোপরে,
আজি কে বানালে জটা পাষাণ অন্তরে।
যে করে করিত শোভা বলয়-কঙ্কণ,
ঝুনু ঝুনু শব্দ শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন।
সুকোমল বাহু হতে সুবর্ণ-বলয়,
কে নিল কাড়িয়া মরি প্রাণে নাহি সয়।
হায় রে! নিষ্ঠুর কাল কি কাজ করিলি,
সোনার কমল তুলে বিজনে ফেলিলি।
বৈধব্য-মরুতে পড়ি সখী স্বর্ণলতা,
শোকরবি-করে কত পাইতেছে ব্যথা!"[৫০]

'অশ্রুকণা' (১৮৮৭ খ্রীঃ) কাব্যের কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর বৈধব্যপরবর্তী জীবনের রচিত কাব্য *'অশ্রুকাব্য'*। বাংলা শোককাব্যের ধারায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর *'অশ্রুকণা'* এক অমূল্য সম্পদ। *'অশ্রুকণা'*(১৮৮৭ খ্রীঃ) কাব্যের *'উপহার'* কবিতায় কবি লিখেছেন,—

"এ শোকাশ্রু। নিরাশার যাতনা-গরল ঢাকা
এ শোকাশ্রু। বাসনার অনন্ত পিপাসা মাখা।
এ শোকাশ্রু হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন!"[৫১]

'অশ্রুকণা' কাব্যের *'তুমি'*, *'বিরহিণী'*, *'শ্মশান'* প্রভৃতি কবিতা বিধবা নারীর মনোবেদনা সকরুণ

ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। *'শ্মশান'* কবিতায় কবি লিখেছেন,—

''নিভিয়াছে চিতানল?—নেভে নি, নেভে নি!
যে শিখা জাহ্নবী-তীরে,
জ্বলিয়াছে ধীরে ধীরে,
দেখহ প্রতাপ তার হৃদয়েতে মোর;—
পাইয়া ইন্ধন চির জ্বলিছে কি ঘোর!''[৫২]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর *'আভাষ'* কাব্যগ্রন্থের *'অবলা', 'নির্মমতা', 'বসে বসে', 'মরণ', 'কামিনীগুচ্ছ' বা বালিকা বিধবা'* প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসছে বৈধব্যের যন্ত্রণা ও হা-হুতাশ। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী *'কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা'* লিখেছেন,—

'' ফুলশয্যা নিশি বিজয়া যামিনী,
মুখেতে মেখেছে ভসম-রাশি।
যাও স'রে ধীরে, ছুয়ো না ছুয়ো না,
কর'না যতন আর ও ফুটিবে না।''[৫৩]

গিরীন্দ্রমোহিনীর *'শিখা'* (১৮৯৬ খ্রীঃ) কাব্যের, *'বসন্ত প্রভাতে', 'শ্রাবণে', 'স্মৃতি'* প্রভৃতি কাব্যে উঠে এসেছে বৈধব্যের মনোবেদনা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিধবা প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে, মানকুমারী বসুর *'কাব্যকুসুমাঞ্জলী'* কাব্য, মীর আল্লাহের *'বিধবা গঞ্জনা'* কাব্য, ইন্দুমতী দাসীর *'দুঃখমালা'* কাব্য, শ্রী প্রণীত *'বিধবা বঙ্গবালা'*, জনৈক মহিলা রচিত *'বিধবা বিলাপ'*, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের *'বঙ্গবিধবা'* কাব্য, রাধারমণ দাসের,—*'ভারত বিধবা'*, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের *'মহিলা কাব্য'* প্রভৃতি কাব্য। এছাড়া, *'সমাচার চন্দ্রিকা', 'ভারতী', 'নবজীবন', 'বামাবোধিনী', 'নব্যভারত'* প্রভৃতি পত্রিকায় একাধিক কবিতার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে বিধবার পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়। উনিশ শতকের গীতি কবিতা রচনার একটা সাধারণ সুর ছিল বিষাদ চেতনা। বিহারীলাল চক্রবর্তী *'সারদামঙ্গল'* কাব্য সম্পর্কে 'ত্রিবিধ বিরহ'এর কথা বলেছিলেন,—মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ ও সরস্বতী বিরহ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবেগ সর্বস্বতা। উনিশ শতকের গীতি কবিতার একটা বড় অংশ জুড়ে উঠে এসেছে বিধবা নারীর বিষাদ যন্ত্রণা।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলে, শিক্ষিত মহলের সাহিত্য চিন্তায়, পক্ষে এবং বিপক্ষে বিধবা বিবাহ এই সামাজিক বিষয়টি কাহিনীর মোড়কে স্থান পেল সাহিত্যে।

উনিশ শতকে বিধবার বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের তালিকা বিশাল। সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে বিধবা বিবাহ-এই সামাজিক আন্দোলন জাত নানা ঘাত-সংঘাত ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়টি। একদিকে সংবেদনশীলতা অন্যদিকে কটাক্ষ ও মুখরোচক প্রণয়কাহিনীর কেন্দ্রিয় বৃত্তে বিধবা চরিত্ররা ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় সৃষ্ট—*'কৃষ্ণকান্তের উইল'* উপন্যাসের বিধবা যৌবনাবতী *'রোহিনী', 'বিষবৃক্ষ'* উপন্যাসের রূপসী বিধবা 'কুন্দনন্দিনী' চরিত্রে দেখা গেছে বৈধব্যের কামনাসক্ত রূপ; আবার একাধিক নাটকে দেখা গেছে বিধবা নারীর অসহায়তার করুণ বৈধব্য জীবনাচার একাদশী পালনের যাপন চিত্র। উনিশ শতকে রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুর দল বিধবা বিবাহকে সুনজরে দেখেননি। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মরা উদার মানসিকতায় 'বিধবা বিবাহ' এর বিষয়টি সমবেদনার সঙ্গে দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সমকালীন বিশিষ্ট নেতৃবর্গ কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ, বিধবা বিবাহের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্যদিকে গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার শর্ম্মা, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর দে প্রমুখ পণ্ডিতেরা বিধবা বিবাহকে পরিবার-সমাজ অবক্ষয়ের সূচক হিসাবে দেখেছিলেন। এই ঘাত সংঘাত নিয়ে লেখা সাহিত্যগুলির একটি তালিকা প্রদান করা যেতে পারে—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	*মৃণালিনী* (১৮৬৯)
		বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
		কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	*শৈশব সহচরী* (১৮৭৬)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	*করুণা* (১৮৭৭)
শতদলবাসিনী দেবী	—	*বিধবা বঙ্গললনা* (১৮৮৪)
দামোদর মুখোপাধ্যায়	—	*দুই ভগ্নী* (১৮৮৬)
রমেশচন্দ্র দত্ত	—	*সংসার* (১৮৮৭), *সমাজ* (১৮৮৮)
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	*দুখানি ছবি* (১৮৯০) *কমলকুমার* (১৮৯৭)
স্বর্ণকুমারী দেবী	—	*স্নেহলতা* (১৮৯২)
শিবনাথ শাস্ত্রী	—	*যুগান্তর* (১৮৯৫)
দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	—	*মূরলা* (১৮৯৭)

ব্রজনাথ বিশ্বাস — *বিধবা* (১৮৮২)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'মৃণালিনী'* (১৮৬৯) উপন্যাসের কাহিনী বৃত্তে বিধবা সমস্যার বীজ রোপিত হয়েছে। পশুপতি ও মনোরমার উপকাহিনীতে বিধবার প্রেম সমস্যার আভাস রয়েছে। হেমচন্দ্রের উক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাকে হেয় করেছেন এবং বিধবা মনোরমার প্রেমকে তিরস্কৃত করেছেন,—''*স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম।...তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।*''[৫৪] মৃণালিনী উপন্যাসে বিধবা নারীর সহমরণকেই কাম্য রূপে বন্দনা করা হয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসে প্রথম লক্ষ্য করা গেল, কুন্দনন্দিনীর বিবাহ এবং নতুন স্বামীসঙ্গলাভ। বিধবা কুন্দনন্দিনী তাঁর প্রিয় পুরুষকে জানিয়েছে,—''*আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।*''[৫৫] কুন্দনন্দিনী প্রাণ দিয়েছে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাকে পুনর্বার জোড়া লাগাতে। কুন্দনন্দিনীর এই নৈতিকতা সধবা নারীর সংসার রক্ষার্থে অর্পিত হয়েছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে রোহিণী বালবিধবা। রোহিণী পুনর্বিবাহের জন্য লোলুপ, পুরুষ সঙ্গকামনা তাকে অবৈধ জীবন যাপনের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করে। গোবিন্দলালের কামনার শিখায় রোহিণীর আগমন, এবং বিনা অপরাধে ভ্রমরের দাম্পত্য সুখ নষ্ট হয়ে যায়। প্রসাদপুর কুঠিতে রোহিণী, জমিদার গোবিন্দলালের উপপত্নী ও রক্ষিতার মত জীবন কাটিয়েছে। হিন্দু সমাজের নৈতিকতার আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট—*'কৃষ্ণকান্তের উইল'* উপন্যাসের বিধবা যৌবনবতী রোহিণী, বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রূপসী বিধবা *'কুন্দনন্দিনী'* চরিত্রে দেখা গেছে বৈধব্যের কামনাসক্ত রূপ। কুন্দনন্দিনী বালবিধবা, রোহিণী ও তাই। বিধবা কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয় বিবাহ তিনি স্বীকার করতে পারেননি, তাই তাকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

১৮৭৬ সালে *'বঙ্গদর্শন'* পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'শৈশব সহচরী'* উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ৪১ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসে একটি বিধবা নারীর প্রেম, বিবাহকথা বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে সরস রসিকতার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র বিধবা নারীর যৌনাচারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শরৎকুমার ও কুমুদিনীর মধ্যে প্রেমের ফল্গুধারা বইয়ে

দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। একটি ত্রিভূজ রচিত হয়েছে রজনীকান্ত, শরৎকুমার ও কুমুদিনীর মধ্যে। দুজন পুরুষ এক বিধবা নারীর প্রতি প্রেমজ টানে দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছে। শরৎকুমার ও রজনীকান্তের উভমুখী প্রেমে কুমুদিনী বিচলিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রজনীকান্তকে বেছে নিয়েছেন। বিধবা নারীর প্রেম, বিবাহ, স্বামী নির্বাচন ও যৌনতাবোধকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ উপন্যাসে আরো একটি বিধবা নারী আছে—বিধু। কুমুদিনীর সহচরী বিধু লোভ রিপুতে আক্রান্ত।

১৮৭৭ সালে *'ভারতী'* পত্রিকায়, আশ্বিন ১২৮৪ থেকে ১২৮৫ ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের *'করুণা'* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। একটি কিশোরীর জীবন কথাকে এ উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। এই কাহিনী বৃত্তে উঠে এসেছে বিধবার কথাসূত্র।

১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়, দামোদর মুখোপাধ্যায়ের (*'জ্ঞানাঙ্কুর'* পত্রিকার সম্পাদক) *'দুই ভগ্নী'* উপন্যাস। *'দুই ভগ্নী'* উপন্যাসের কাহিনী বৃত্তে রয়েছে যোগেন্দ্র-বিনোদিনীর সুখী দাম্পত্য জীবনে বিধবা কমলিনীর প্রণয়-আসক্ত আগমন। বিনোদিনীর সহোদরা ভগিনী কমলিনী বালবিধবা। কমলিনীর আট বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং দশ বছর বয়সে অকাল বৈধব্যের শিকার হয়। কমলিনী যোগেন্দ্রর প্রতি আসক্ত। কমলিনী যোগেন্দ্র-বিনোদিনীর দাম্পত্য পরিবার জীবনে প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কমলিনীর যৌবনাবেগ ও হৃদয়াবেগের ছবি উপন্যাসে পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় বিধবা কমলিনীর মনের গোপন যৌবনাবেগের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় লিখেছেন,—*''কমলিনী যোগেন্দ্রের মস্তকে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে অতৃপ্ত নয়নে তাহার বদনশ্রী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—'শরীর রক্ত মাংসে গঠিত। হৃদয় মানব-হৃদয়ের হীন বৃত্তিসমূহে পূর্ণ। তবে কেমন করিয়া আমি এ লোভ সংবরণ করিব? জগতে কোন্ রমণী এ লোভ দমন করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ পারিয়া থাকে, সে দেবী। কিন্তু আমি সে দেবত্ব প্রার্থনা করি না। আমি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন নিবারণ করিতে পারিব না। লোকে ইচ্ছা হয় আমাকে পিশাচী বলুক যদি এ পাপে অনন্ত কাল আমায় নরক ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি এ লোভ ত্যাগ করা আমার অসাধ্য। বিনোদিনীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কি? এ জগতে কে কবে পরের সর্ব্বনাশ না করিয়া আত্মসুখ সংস্থান করিয়াছে?... কত বাদশাহ, কত নরপতি, পিতৃহত্যা, ভাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি সামান্য রাজপদ লোভে সেই সকল দুষ্কর্ম করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমি এই অতুলনীয় সম্পদ হইতে আমার ভগ্নীকে কেন বঞ্চিত করিতে পারিব না?''*[৫৬] বিধবা কমলিনী

যোগেন্দ্রর প্রতি তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য দাসীর সহায়তায় চক্রান্তের পর চক্রান্ত করেছে। যোগেন্দ্রের চিঠিগুলি সরিয়ে ফেলে সহোদরা বিনোদিনীকে বুঝিয়েছে যোগেন্দ্রের অপ্রেমের কথা। যোগেন্দ্রের হৃদয়ে বিধবা কমলিনীর প্রতি কোনো দুর্বলতা দেখা যায়নি। অসুস্থ যোগেন্দ্রের রোগশয্যার পাশে বিধবা কমলিনী উপস্থিত হয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছে, বিনোদিনীর গর্ভে অন্যের সন্তান। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়—বিনোদিনী বিষপান করে, দাসী জলে ডুবে আত্মহত্যা করে এবং কমলিনী উন্মাদ হয়ে যায়। বস্তুত ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় 'দুই ভগ্নী' উপন্যাসে বিধবা চরিত্র ও বিধবার প্রণয়কে পরিবার ভাঙন ও সংকটের বহ্নিশিখা রূপে উপস্থাপিত করেছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *'সংসার'*[৫৭] (১৮৮৬), *'সমাজ'*[৫৮] (১৮৯৪) দুটি সামাজিক উপন্যাসে বিধবার সংকট সমস্যা ও প্রণয়কে চিত্রিত করেছেন। রমেশচন্দ্র কুসংস্কারমুক্ত উদার মন নিয়ে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহকে যুক্তি-তর্কসহ স্বীকৃতি দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র বিধবা বিবাহের সমর্থনে *'সংসার'* উপন্যাসটি রচনা করেন। *'সংসার'* উপন্যাসে রাঢ়ের পল্লীচিত্রে, দুই ভগিনী—বিন্দু ও সুধার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। বালবিধবা সুধার পুনর্বিবাহ এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয়। শিক্ষিত যুবক শরৎ বালবিধবা সুধাকে পুনর্বিবাহ করতে চায়। তাই নিয়ে গ্রামে ও কলকাতায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কলকাতার নাগরিক সমাজ, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক ধরা পড়েছে। বিধবাবিবাহ যে পরিবারিক জীবনকে অশান্তিতে বিদীর্ণ করতে পারে না, সে কথাই ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বিধবা বিবাহের বৈধতা ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। শরৎ-সুধা ও হেমচন্দ্র-বিন্দুর প্রেম এ উপন্যাসের ভিত্তি। বিধবা বিবাহের প্রশ্নে চারপাশে নিন্দা, কুৎসা ও প্রতিবাদ, রঙ্গতামাশা, কটুক্তি প্রবল হলেও শরৎ সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করেছে। সংসার উপন্যাসে বালবিধবা সুধা এবং শিক্ষিত যুবক শরচ্চন্দ্রের বিবাহ গ্রাম্য ও নাগরিক সমাজে তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্তের *'সমাজ'* উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। *'সমাজ'* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহত পত্নীর উপর পীড়ন, বাঈজী ও রক্ষিতা পোষণ—প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক। তাঁর *'যুগান্তর'* (১৮৯৫), *'নয়নতারা'* (১৮৯৯) *'বিধবার ছেলে'* (১৯১৬) প্রভৃতি উপন্যাসের কাহিনীতে উঠে এসেছে বিধবা অনুষঙ্গ।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বঙ্কিম অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'মধুমতী'* নামের গল্প। যদিও *'মধুমতী'* কে উপন্যাস হিসাবে ছাপা হয়েছে *'বঙ্গদর্শন'* পত্রিকায়। এ গল্পে আগাগোড়া মধুমতী নামক এক বিধবার কথা পরিবেশিত হয়েছে। স্মৃতিভ্রষ্ট এক বিধবা নারীর গল্প *'মধুমতী'*। পুতুলের প্রতি বালিকার প্রেমের ন্যায় মধুমতীর প্রেম। পঁচিশ বর্ষীয় যুবক করালীপ্রসন্ন ও মধুমতীর মন দেওয়া নেওয়ার গল্প *'মধুমতী'*। *'মধুমতী'* গল্পে গল্পকার লিখছেন,—*"করালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুমতী, তুমি সধবা না বিধবা'' তাহা কিছু তোমার মনে পড়ে? এবার মধুমতী কথা কহিল। বলিল, "বিয়ের কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয় বিধবা।''...*

"বিধবার বিয়ে হয়, জান?''

ম।"তোমারই মুখে শুনিয়াছি।''

ক।"তুমি আবার বিবাহ করিবে?''

ম।"করিব না কেন!''

ক।"কাকে বিয়ে করবে?''

ম।"তুমি যাকে বল।''

ক।"আমাকে?''

মধুমতী তখন লজ্জায় মুখ নত করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে কহিল, "করিব''।"[৫৯]

উনিশ শতকের যুগ পরিবেশে দাঁড়িয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাঁর গল্পের কাহিনী গ্রন্থনায় বিধবা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দে লেখেন, *'মহামায়া'* নামে ছোট গল্প। *'মহামায়া'* গল্পটি বিধবার প্রেম নিয়েই রচিত। মহামায়া নামক এক বিধবার বুভুক্ষু হৃদয় রহস্যের গল্প *'মহামায়া'*। এ গল্পে অসামাজিক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিধবা হওয়ার পর মহামায়ার হাত পা বেঁধে চিতায় সহমরণের জন্য সমর্পণ করা হয়। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে শ্মশান-যাত্রীরা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলে চিতা থেকে উঠে মহামায়া পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে এবং ঘোমটা টেনে রাজীবের কাছে আশ্রয় নেয়। রাজীবের বিবাহিতা স্ত্রী না হয়েও বিধবা মহামায়া রাজীবের সঙ্গে একত্রে বাস করে বহুদিন। চিতার আগুনে ঝলসে যাওয়া বিধবা মহামায়ার মুখশ্রী দেখে চমকে উঠেছে রাজীব। অবশেষে মহামায়া নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের *'প্রতিবেশিনী'* গল্পকাহিনীতে বিধবার প্রণয় গুরুত্ব পেয়েছে। এই গল্পে দেখ যায়, দুই বন্ধু একই বিধবার প্রেমে পড়ে। এই বিধবার প্রেমকে ঘিরে দুই বন্ধুর মধ্যে তৈরি

হয় সংকট। গল্পের দুটি পুরুষ চরিত্র,—কথক ও নবীন। এ গল্পের কথক তত্ত্বগত ভাবে বিধবা বিবাহে বিশ্বাসী। প্রতিবেশিনী বিধবাটিকে সে ভালোবাসার পরিবর্তে পূজা করেছে মনে মনে। ফলে কোনদিনই সে ওই বিধবাকে বিয়ে করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেনি। কথকের মধ্যে বিধবার প্রতি এক প্রকারের প্রশান্ত মুগ্ধতা তৈরি হয়েছে। কথক জানিয়েছে,—"*জ্যোতির্বিদ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম,...সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তবিক্ষোভ দমন করিয়া দিত।*"[৬০] অন্যদিকে বন্ধু নবীনের বিধবা বিবাহ নিয়ে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই। সে কোনো প্রকার সূক্ষ্ম চিন্তার ধার ধারে না। বিধবা বিবাহের বাস্তব অসুবিধাগুলির কথাই সে ভাবে। সে এই বাস্তব অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে বিধবা বিবাহ করে।

১৮৬৭ সালে বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়, শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহের নকশা জাতীয় গ্রন্থ 'রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্'। এ গ্রন্থে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। *'রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্'* বাদ-প্রতিবাদ মূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ লিখেছেন,—"*প্রায় তিন বৎসর হইল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন এক ব্যক্তি "কৌতুক প্রবাহ" নামক একখানা পুস্তক এক অলৌকিক গল্প ছলে বিধবা বিবাহ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করত প্রকটিত করিয়াছেন। তদ্বিরুদ্ধে কতিপয় পংক্তি লেখাই আমার এই ক্ষুদ্র মত পুস্তকের উদ্দেশ্য।*"[৬১]

এই গ্রন্থে জগচ্চন্দ্র কাহিনীকারে জানিয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণের পর ঢাকায় উপস্থিত হন। এবং এই দিন পৃথিবীর কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ অনেক বিষয়ের পর্যালোচনা হয়। উক্ত সভায় বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে আলোচিত হয়। উক্তসভায় বাদী-বিবাদী দুইপক্ষের বিধবা বিবাহ বিষয়ক মতামত আলোচিত হয়। কোর্টরুমে বিচার প্রক্রিয়ার মত ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সামনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষদের হাজির করা হয়েছে। জগচ্চন্দ্র বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সওয়াল করে জানিয়েছেন,—"*পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দু সমাজের জন্যে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, ইতিপূর্ব্বে যবন অধিকার সময় তাহার অনেকাংশ অব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সেই সকল নিয়ম প্রচলিত না হইয়া যদ্যপি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।...বর্ত্তমান কালে যে বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বনের একটি*

উপায় আছে, তাহাতেই কত শত ভদ্র মহিলারা স্বীয় পতি বিনষ্ট করত গণিকা শ্রেণীর দলপুষ্টি করিতেছে, এমতাবস্থায় পূর্ব্বে সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত না হইয়া বিধবা বিবাহ চলিত হইলে কত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।"[৬২] বস্তুত এভাবেই উনিশ শতকের গদ্য কাহিনীর ঘটনা বৃত্তে বিধবার পুনর্বিবাহ নিয়ে চাপান-উতোর লক্ষ্য করা গেছে।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলা নাটকে সবচেয়ে বেশি বিধবা বিবাহের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে উঠে আসে । ১৮৫৬ সাল পরবর্তী কয়েক দশকের বাংলা সামাজিক নাটকের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'বিধবা' প্রসঙ্গ সামাজিক নাটকের কাহিনীবৃত্তে উঁকি দিয়েছে সবচেয়ে বেশি,—কখন সমাজ সমস্যা হিসাবে, কখন বা হাস্যরসের খোরাক হিসাবে কখন বা নারীর মর্মপীড়ার আলেখ্য হিসাবে। প্রসঙ্গত দেখে নেওয়া যেতে পারে—১৮৫৬ থেকে ১৮৬৬ এই দীর্ঘ দশ বছরের সামাজিক নাটক রচনার ইতিবৃত্তে কীভাবে উঠে এসেছে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ[৬৩],—

"১৮৫৬

বিধবা বিবাহ	—	উমেশচন্দ্র মিত্র।
বিধবোদ্বাহ	—	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
বিধবা মনোরঞ্জন	—	রাধামাধব মিত্র।

১৮৫৭

বিধবা পরিণয়োৎসব	—	বিহারীলাল নন্দী।
বিধবা বিষম বিপদ	—	অজ্ঞাত।
চপলা চিত্তচাপল্য	—	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

১৮৫৮

সপত্নী নাটক	—	তারকচন্দ্র চূড়ামণি।
বিধবা বিবাহ বিষম দায়	—	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
কলি-কৌতুক	—	নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি।
চার ইয়ারের তীর্থযাত্র	—	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৯

বাসরকৌতুক	—	শ্যামাচরণ দে।

১৮৬০

নীলদর্পন নাটক — দীনবন্ধু মিত্র।

বিধবা বিরহ নাটক — শিমূয়েল পিরবকস্।

বাল্যোদ্বাহ নাটক — শ্যামাচরণ শ্রীমানি।

বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক — প্রসন্নকুমার পাল।

একেই কি বলে সভ্যতা — মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ — " ।

১৮৬১

দলভঞ্জন নাটক — হারাণচন্দ্র (শর্ম্মা) মুখোপাধ্যায়।

লম্পট চৈতন্যদয় — যদুনাথ চৌধুরী।

কুলীন কায়স্থ — অম্বিকাচরণ বসু।

১৮৬২

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক —১ম/২য় খণ্ড) কুশদেব পাল।

পুনর্বিবাহ নাটক — গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভস্র শীঘ্রং — হরিশচন্দ্র মিত্র।

ম্যাও ধরবে কে? — " ।

গুলি হাড়কালি নাটক — ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অশুভ পরিহারক — গৌরমোহন বসাক।

শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি — ভুবন মোহন চক্রবর্তী।

পাড়া গাঞ্ঞে একি দায়? — রামনাথ ঘোষ।

শ্যামকিশোরী — হরিশচন্দ্র বসাক।

কি মজার গুড ফ্রাইডে — অজ্ঞাত।

১৮৬৩

হুড়কো বৌয়ের বিষম জ্বালা — রামকৃষ্ণ সেন।

একেই বলে বাবুগিরি — কালাচাঁদ শর্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

কন্যা বিক্রয় — নফরচন্দ্র পাল।

না বিইয়ে কানাইয়ের মা — অজ্ঞাত ।

পরের ধনে বরের বাপ — ব্রজমাধব শীল।

কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে — ব্যোমকেশ বাঙ্গাল।

বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি— রাধামাধব হালদার।

অশুভস্য কালহরণং — গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্তী।

কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের একি দম্ভ—মুনশী নামদার।

স্বর্ণশৃঙ্খল — দুর্গাদাস কর।

প্রাণেশ্বর — প্রাণনাথ দত্ত।

নবীন তপস্বিনী — দীনবন্ধু মিত্র।

১৮৬৪

বিধবা বিলাস নাটক — যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মুষলং কুল নাশনং — দ্বারকানাথ মিত্র।

চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা — বিশ্বম্ভর দত্ত।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বে — হরিমোহন কর্মকার।

মুষলং কুলনাশনং — দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৫

যেমন কর্ম তেমনি ফল — রামনারায়ণ তর্করত্ন।

১৮৬৬

নবনাটক — রামনারায়ণ তর্করত্ন।

সধবার একাদশী — দীনবন্ধু মিত্র।

বিয়ে পাগলা বুড়ো — ,, ।

বুঝলে কিনা — নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উল্লিখিত দশ বছরের সামাজিক নাটক রচনার তালিকায় একথা স্পষ্ট যে, উনিশ শতকে বিধবার পুনর্বিবাহ এই সামাজিক সমস্যা ছিল এক বহু চর্চিত ও তর্কের বিষয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী দশকগুলির সামাজিক নাটকের চালচিত্র বিচার করলে দেখা যাবে— বিধবার সংকট, সমস্যা ও উত্তরণের ছবি বাংলা নাটকে ঘুরে ফিরে এসেছে। ১৮৭৬ সালে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু হবার পর সামাজিক প্ররোচনা ও উস্কানিমূলক নাটক রচনার প্রবাহ কমে আসে। বাংলা নাটক পৌরাণিক কাহিনীর ইতিবৃত্তে অধিক মাত্রায় ঘোরা-ফেরা করে। সামাজিক যে সব

নাটক লেখা হয়, সেগুলি শালীনতা বজায় রেখে রচিত হয়। কারণ নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার ফলে সামাজিক নাটক রচনার পর লালবাজারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অনুমোদন নিয়ে তবে ছাপতে হত এবং অভিনয়ের অনুমোদন নিতে হত। সেকারণে ১৮৭৬ পরবর্তীকালে যেসব সামাজিক নাটক রচিত হয়েছে সেখানে বিধবা বিবাহ বিষয় কেন্দ্রিক নাটকগুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গালিগালাজ অপেক্ষা সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি, বিধবা বিবাহ বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা নাটক সাফল্যের সঙ্গে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বহু রজনী অভিনীত হয়েছে। বাঙালি দর্শকমণ্ডলী সে নাটক সাদরে গ্রহণ করেছে।

উৎস সূত্র ও টীকা:

১. *বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত*, সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত, কলিকাতা ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ,পৃ ২৪৭।

২. *বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* ১ম খণ্ড, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জানুয়ারি, ১৮৫৬।

৩. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃ ২৪৯।

৪. *বিদ্যাসাগর*, বিহারীলাল সরকার। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮৪।

৫. *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (২য় খণ্ড),কলিকাতা, সংস্কৃত বিদ্যালয়, ৪ঠা কার্ত্তিক, সংবৎ ১৯১২ [১৮৫৬]। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, ২৫ নং সুকিয়াস ষ্ট্রীট্, ২রা আশ্বিন ১৩০২, সম্পাদনায় নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা, পৃ ২২০-২২২।

৬. *রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত*, রাজনারায়ণ বসু, কুন্তলীন প্রেস ১৯০৯, কলিকাতা ১৩১৫,পৃ ৯৮-৯৯।

৭. *বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা*, গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মা, ১৭৬৭ শকাব্দ, পৃষ্ঠা ২২।

৮. *দেশ* পত্রিকায় পশুপতি শাসমল এই গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন, ১৫ই বৈশাখ ১৩৭৪ দেশ পত্রিকা।

৯. *বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা*, শিবনাথ রায়, কলিকাতা, ভাস্কর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত,

ইং১৮৫৫, পৃষ্ঠা ২৬।

১০. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার,চৈতন্য লাইব্রেরী'র ক্যাটালগ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

১১. *সাম্য* (১৮৭৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, সম্পাদনা কাঞ্চন বসু, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ৩৫০।

১২. *সাম্য*, ঐ, পৃ ৩৫১।

১৩. *সমাচার সুধাবর্ষণ*, ১২ নভেম্বর ১৮৫৫, ৪৪৮ সংখ্যা, বিদ্যসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃ ২৪৮।

১৪. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, বিনয় ঘোষ,ঐ, পৃ ২৫২।

১৫. *বঙ্গভাষার লেখক*, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেসিন্ যন্ত্রে, শ্রীযুক্ত নুটবিহারী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, পৃ ৭২৭।

১৬. ঐ, পৃ ৭২৭।

১৭. *বিধবা-বিবাহ*, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দ্বারা মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত,১৩১৭,পৃ১১১।

১৮. *বিধবা বিবাহ*, ঈশ্বরগুপ্ত ঐ, পৃষ্ঠা ১১১।

১৯. *বিধবা-বিবাহ আইন*, ঐ, পৃ১১২।

২০.*বিধবা-বিধবা-আইন*, ঐ, পৃ ১১২।

২১. *দাশুরায়েরপাঁচালী*, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিতওসংকলিত১৯১০পৃষ্ঠা ৬২৬।

২২.*দাশুরায়েরপাঁচালী*, ঐ, পৃ ৬২৭।

২৩.*দাশুরায়েরপাঁচালী*, ঐ, পৃ ৬২৭।

২৪.*দাশুরায়েরপাঁচালী*, ঐ, পৃ ৬২৫।

২৫.*দাশুরায়েরপাঁচালী*, ঐ, পৃ ৬২৮।

২৬.*দাশুরায়েরপাঁচালী*, ঐ, পৃ ৬২৯।

২৭. *দাশুরায়েরপাঁচালী*, ঐ, পৃ ৬২৯।

২৮. *মেঘনাদবধ কাব্য*, (নবম সর্গ), মধুসূদন দত্ত, হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, এস ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১৯৬৭,পৃ১১৫।

২৯. *বীরাঙ্গনা কাব্য*, মধুসূদন দত্ত, ভবানীগোপাল সান্যাল সম্পাদিত, মডার্ণ বুক এজেন্সী

প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯১,পৃ ২৭-২৮।

৩০. *বিধবা রমণী*, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতাবলী' (১৮৭০ ১ম খন্ড), হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,জ্যৈষ্ঠ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১, সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, পৃ২৬ ।

৩১. *বিধবা রমণী*, ঐ, পৃ ২৬-২৭।

৩২. *হতাশার আক্ষেপ*, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতাবলী, খন্ড-১, পৃ১২১।

৩৩. *বিধবা কামিনী*, ' *অবকাশরঞ্জিনী*, নবীনচন্দ্র সেন, (১ম ,২য় খন্ড ১৮৭১), কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরি, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মাঘ ১২৮৫ সাল, পৃ ৬৬।

৩৪. *বিধবা কামিনী*, ঐ, পৃ ৬৬।

৩৫. *প্রতিমা বিসর্জন*, নবীনচন্দ্র সেন, অবকাশরঞ্জিনী ১ম খন্ড,পৃ ৯৯।

৩৬. *প্রতিমা বিসর্জন*,ঐ, পৃ ১০১।

৩৭. *বিষন্ন কমল*, নবীনচন্দ্র সেন, (অবকাশরঞ্জিনী ১ম খন্ড, পৃ ১৬৭।

৩৮. *কে তুমি*, নবীনচন্দ্র সেন, অবকাশরঞ্জিনী ২য় খন্ড,শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট, ক্যানিং লাইবেরী হইতে প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ। পৃ১৩৭-১৩৮।

৩৯. *বিধবা বঙ্গাঙ্গনা*, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ঢাকা সুলভ প্রেস, ৩০শে বৈশাখ ১২৭০।

৪০. *বিধবা বঙ্গাঙ্গনা*, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ঐ,পৃষ্ঠা ৩-৪ ।

৪১. *বিধবা বঙ্গাঙ্গনা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৬।

৪২. *বিধবা বঙ্গাঙ্গনা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৮১।

৪৩. *বিধবা বঙ্গাঙ্গনা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৮১।

৪৪. *ঊনবিংশ শতাব্দীর সভাসমিতি ও বাংলা সাহিত্য*, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক দে বুক স্টোর, চৈত্র ১৩৬৬,পৃ ৬৪।

৪৫. *আমি কে, 'অশোকগুচ্ছ'* (১৯০০), দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, গোরা সিংহ রায়, সম্পাদিত জানুয়ারি ২০০২,ভারবি, পৃ ৪৪।

৪৬. *বিধবার আরশি,'অশোকগুচ্ছ'* (১৯০০), দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,ঐ পৃ৪৯।

৪৭. *তারপর*, দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা,ঐ পৃ ৫২।

৪৮. *সধবা, 'অপূর্ব নৈবেদ্য'*, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ও প্রকাশিত, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা, সন ১৩১৯ সাল, পৃ৬।

৪৯. *বিধবা, 'অপূর্ব নৈবেদ্য'*, ঐ, পৃ৮।

৫০. *'সঙ্গিনীর বৈধব্য'* (কবিতাহার), *গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ড. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ভারবি, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ ৩০।

৫১. *উপহার* (অশ্রুকণা), *গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭।

৫২. *শ্মশান* (অশ্রুকণা), *গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ৭২, পৃষ্ঠা।

৫৩. *কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা* (আভাষ), *গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী*, বহুবাজার কলিকাতা, সন ১২৯৭, পৃ১০০।

৫৪. *মৃণালিনী'* (১৮৬৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (উপন্যাস খণ্ড) সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার, সাক্ষরতা প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রথম প্রকাশ, ১লা জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ ১৯৬।

৫৫.*'বিষবৃক্ষ'* (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ ২২৫।

৫৬. *দুই ভগ্নী*, দামোদর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩০৯ পৃ ৫৮।

৫৭. সংসার, রমেশচন্দ্র দত্ত, চৈত্র সংক্রান্তি, ১২৮২ বঙ্গাব্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির।

৫৮. সমাজ, রমেশচন্দ্র দত্ত, চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির।

৫৯. *মধুমতী*, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০, পৃষ্ঠা ৭০।

৬০. *প্রতিবেশিনী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, অখন্ড, সরস্বতী লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা ৩৬৯।

৬১. *রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্‌*, শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ, কলিকাতা, চিৎপুর রোড, বটতলা ১০০-১০১/৩ নং, সন ১২৭৪ সাল ৭ই শ্রাবণ, বটতলার বই ২য় খণ্ড , অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০০০,পৃ ১০৮।

৬২. *রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্‌*, শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ, ঐ,পৃষ্ঠা ১১১।

৬৩. *সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, জয়ন্ত গোস্বামী,সাহিত্যশ্রী, ১৩৮১। *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*, আশুতোষ ভট্টাচার্য,(১ম খন্ড) (১৭৯৫-১৯০০) এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮। *বাংলা নাটক*-দেবকুমার বসু (১৮৫২-১৯৫৭) গ্রন্থ অবলম্বনে এই তালিকা নির্মিত।